প্রবাসবন্ধুর নিবেদন .....August 30, 2020

বাইশে শ্রাবণে / কবি প্রণামে

জীবনে ও মরণে / জীবন দর্শনে

জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।'

পাঠ ও আবৃত্তিতে :

অসিত সেন, নীতা শেঠকার, সোমা ঘোষ, আলী তারেক, শ্যামলী মিত্র, বিশ্বরূচি মিত্র, শফিক আহমেদ, কমলপ্রিয়া রায়, নাহিদ সুলতানা, অচিন্ত্য ঘোষ, কাজল রায়, রূপছন্দা ঘোষ ও সুমিতা বসু

গানে :

নমিতা রায়চৌধুরী, কমলপ্রিয়া রায়, নাহিদ সুলতানা, বিশ্বরূচি মিত্র ,আলোক রায়, অচিন্ত্য ঘোষ, সোমনাথ বসু ও অমিত দে

নাচে :

সুপ্রদীপ্তা দত্ত ও উর্মি ঘোষ

Technical Support:

Rajib Roychowdhury & Abhishek Banerjee

‘

==========

Background: নজরুলের কণ্ঠে

নমিতা (পুণ্য আগুন)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে॥

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে....

সুমিতা রবীন্দ্রনাথ / হাতের লেখা / (screen) রবীন্দ্রনাথের শব যাত্রা / music

দিনটা ছিল ১৯৪১ সনের সেই ঝরো ঝরো অথচ মূক ৭ই আগস্ট, যার বাংলা নাম ২২শে শ্রাবণ। তখন সেই বয়েস যখন মনের মাটিতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার দাগ পড়ে। সেই মাটিতে উদাসীন নির্মম কঠিন কোনো ধাতুতে ইমারাত তৈরি করা কল্পনাও করা যায়না। সেই বয়েস সেই সময়।

জানতাম তিনি কোলকাতায় আনিত। চেতনা অচেতনার মাঝখানের চৌকাঠে অনিশ্চিত অবস্থায় আচ্ছন্ন। প্রতিদিন তাঁর স্বাস্থ্যসমাচার সংক্রান্ত পত্রিকা বের হয়, আর তার ওপর তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ি আমরা, যারা দূরবাসী, আচার্য্য দ্রোণের একলব্য শ্রেনীর। কুয়াশা কেটে ফেটে মাঝে মাঝে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার রৌদ্রাভ শুভ্র রুপ দেখা দেয়, তেমনি তখনও চলছে মুখে মুখে রচনা। প্রায় প্রত্যহ একটি। অবিশ্বাস্য সেইসব ঘটনার সাক্ষী তখনকার প্রভাতী পত্রিকাগুলোর কয়েকটি সংখ্যা।

আর অজ্ঞাত অগণিত আমরা তখনও কি সেই প্রত্যাশা করছিনা যে, পরমাশ্চর্য কোনো প্রর্ত্যতাবন ঘটবে। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে কম্পিত পায়ে তিনি তো আগেও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রান্তিক এক বিন্দুতে। কিন্তু ফিরেও তো এসেছিলেন আবার। ইতিহাস কি নিজেকে আবৃত করতে পারেনা আবার? পারে হয়তো, করেনি। খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণে, সেই অমোঘ সত্যটাকে শিরোধর্যা করে বেরিয়ে এসেছিল, রবি অস্তমিত ।

মুহূর্তে সব কাজ থেমে গেল। কলকাতা শহর উপচে পড়ল রাস্তায়, স্কুল কলেজ শূন্য, রাজকার্য অর্থহীন হয়ে গেল। উকিলের শামলা, পাদ্রীর আলখাল্লা, হলুদ আর গেরুয়া রঙের উত্তরীয়, গোল টুপি, বাঁকা টুপি, পাগড়ি, কেও চলছে, কেও ছুটছে, কেও বা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। থেকে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি তাঁর যাবার পথটা ধুয়ে ধূলিহীন করে দিচ্ছে। ঢেউ এর পর আসছে ঢেউ, ভেঙে ভেঙে ঢেউ ছড়িয়েও যাচ্ছে। সেই ঢেউয়ের চুড়ায়,তলায়, ফেনায় ফেনায় মহামান্য নেতা থেকে সামান্য মানুষে মানুষে গড়া জনতা মিলে মিশে একাকার। তারই মধ্যে শয়ান বনস্পতিকে বহন করে নিয়ে গেল একদল লোক। অথবা সবার আগে আগে ওই যে তিনি নিজেই বুঝি চলেছেন, চলে গেলেন।

এমন নয় যে অকাল মৃত্যু, এমন নয় যে অপ্রত্যাশিত, তবু সেই মুহূর্তে কঠিন মাটি ফেটে গিয়ে গহ্বর খুলে গেল। রবীন্দ্রনাথ নেই, কে আমাদের ভালোবাসবেন, শাসন করবেন। কাকে আমরা উত্যক্ত করব সেই সব তুচ্ছ দাবি নিয়ে, যা শুধু তাঁরই হাতে রত্ন হয়ে উঠত। স্বদেশের সংকটের সময় কে আমাদের পরামর্শ দেবেন, তর্কযুদ্ধ মিটিয়ে দেবেন কে? জগতটাকে এনে দেবেন আমাদের দরজায়, আমাদের নবজাত সন্ততির নামকরণ করবেন, আমাদের জীবনে ও প্রতিষ্ঠান গুলিতে অর্পণ করবেন স্বীয় মর্যাদা।

এতক্ষণ শক্ত ছিলাম, না পারছি সদ্য সৃষ্ট শূন্যতাকে পুরণ করতে, না আছে শক্তি 'তবু শূন্য শূন্য নয়' বলতে। কিন্তু যেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা তাঁর সঞ্চয়িতা কাব্য সংকলনটি, সেই মুহূর্তে নিজেকে আর ধরে রাখা গেলো না, একটা আঘাত ভেতরটাকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, যেন এই দেখাটুকুরই অপেক্ষায় ছিলাম। প্রয়োজন ছিল sweet my child I live for thee বলে ভেঙে পড়া, জননীর মত।

==========

1.: পাঠ : সুমিতা

কতবার পড়া তার কবিতাগুলোকে মনে হোলো অনাথ, পিতৃহীন। স্রষ্টার অর্তধনানে তাঁর সৃষ্টি কি করুণ। আস্তে আস্তে বাস্প জমছে চোখের পাতায়। মনের দিগন্তে আর কালো কোমল ছায়ায় টের পাচ্ছি, ঠেকে যাচ্ছে। সূর্যগ্রাসের সময় যেমন ঢাকে। অঝোর ষর্বণ তখন বাইরের প্রকৃতিতে আর নেই। সেই জলধারা ঠাঁই নিয়েছে ঘরে ঘরে, টলমল মনের পরমনে। পরিবেশ যখন স্নাত, স্নিগ্ধ, তখন বহ্নিমান চিতা জ্বলছিল গঙ্গার কোলে।

গান : অমিত দে

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।

সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো॥

অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।

জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধাসাগর॥

2. পাঠ : শ্যামলী মিত্র

আমরা আজ 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠান শুরু করলাম সেই অস্তমিত রবির কথা নজরুল ইসলামের কণ্ঠে এবং বুদ্ধদেব বসুর লেখায়।

২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮| সেদিন অঝোর বৃষ্টিস্নাত দিন— গুরুদেবের পায়ে প্রতিমাদেবী অঞ্জলি ভরে চাঁপাফুল দিয়ে গেলেন। দুপুর ১২:১০ মিনিটে কবি সম্পূর্ণ চলে গেলেন। নন্দলাল বসু গুরুদেবের শেষযাত্রার পালঙ্ক নির্মাণ করলেন, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "যা, আজ রাজার রাজা নগর পরিক্রমা করে চিরবিদায় নেবেন, বেনারসি চাদর নিয়ে আয়"— লাল বেনারসি কাপড়ে সোনালী বুটি দেওয়া চাদর পাতা হল পালঙ্কে। সহস্র জুঁই, বেলের মালায় সজ্জিত সেই রাজ পালঙ্ক। গুরুদেবকে সাদা বেনারসি জোড় পরানো হল, গরদের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, গলায় রজনীগন্ধার গোড়ের মালা, কপালে চন্দন। একি মহারাজ, একি তোমার বেশ ! তাঁর চারপাশে শতসহস্র

শ্বেতপদ্ম ও রজনীগন্ধা। তাঁর হাতদুটি বুকের কাছে ছিল, সেখানে দেওয়া হল একটি শ্বেতপদ্ম কোরক। যেন ঈশ্বর নিদ্রামগ্ন। শত সহস্র মানুষের কাঁধে— শুরু হল অন্তিম যাত্রা।

3. পাঠ : **কমলপ্রিয়া**

ঠাকুরবাড়িতে বেশিক্ষণ শবদেহ রাখার রীতি নেই, বিশেষত মধ্যাহ্নে যিনি প্রয়াণ করেছেন বিকেলের মধ্যে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেই হবে। স্থির হ'ল, কলকাতার রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিমতলায় যাওয়া হবে ....চিৎপুর দিয়ে দক্ষিণে তারপরে উত্তরে নিমতলার পথে ভেসে চলেছেন মানুষের ঢল জোড়াসাঁকো থেকে-- ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে তাঁর খাট| খাট ভেসে চলেছে অগণিত অনুরাগী ভক্তদের হাতে হাতে, কাঁধে কাঁধে| ১২৬৮-র ২৫-এ বৈশাখ যে রবির উদয় হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন গলির ছ'নম্বর বাড়িতে, সেই রবি সেই বাড়িতেই অস্ত গেলেন | সেদিন গোধূলি গগনে মেঘে ছেয়ে গিয়েছিলো কলকাতার আকাশ, ঝর ঝর শ্রাবণধারার মাঝে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার রবি অস্তমিত, অমৃতধামযাত্রী— বর্ষণ সেদিন নেমেছিল অঝোরে সারা বাংলা, ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্ব জুড়ে।

গান : **নমিতা**

সমুখে শান্তিপারাবার--

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি--

অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥

সমুখে শান্তিপারাবার-.....

4. পাঠ : **নীতা**

আমাদের হিউস্টন প্রবাসবন্ধুর বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে আমরা তাঁরই লেখা কবিতা ও গান দিয়ে আজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শনের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসটিকে— যা শৈশবে জোড়াসাঁকোর আবহাওয়ায় উপনিষদের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল — পুরোধা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং। পাশাপাশি কিশোরবেলা থেকেই বৈষ্ণব সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে আকুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে শিলাইদহ -সাজাদপুর পর্বে কবিমনকে আপ্লুত করেছে লোকসাহিত্য, বিশেষ করে বাউল জীবনদর্শন। এছাড়াও ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্য-সংগীত ও ভাবনা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত ও সাহিত্যও কবির মনের আঙিনায়— পল্লবিত কুসুমিত প্রতিনিয়ত। আমাদের এই স্বল্প সময়সীমায় ও পরিসরে সকল বিষয় দেখার সুযোগ নেই । আমরা শুধু তাঁর বিশালত্বের একটি

দিকেই আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করেছি, যা মানবজন্মের মূল সুর: সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান, মৃত্যুর দুয়ারটুকু সংশয়হীন ভাবে পেরোনোর শক্তি দেয় এবং মরণ সেখানে শ্যাম সমান হয়ে জীবনদেবতার উদ্দেশে আকাশ প্রদীপ জ্বালায়— তা উপনিষদেরই হোক কিংবা লোকগানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম ভাবনায়ই হোক।

রাণী চন্দ লিখেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ নাকি একটির পর একটি রবীন্দ্রসংগীত একমনে শুনতে শুনতে বলে উঠতেন, 'তোমরা সব রবিকার জীবনী খুঁজছ, রবিকার গানই তো তাঁর জীবনী। সুর ও কথার অন্তরে তাঁর জীবন্ত ছবি ওখানেই পাবে।'

আজ, তাঁরই গানে-নাচে-অভিনয়ে-কবিতায়-পাঠের মাধ্যমে দেখব 'উপনিষদের 'জীবনদেবতা', 'প্রাণসখা' আর লোকগানের 'মনের মানুষ' কোথায় যেন মিলে মিশে একাকার— তাই বাইশে শ্রাবণ জীবনের উৎসব, আমাতে-প্রাণেতে পরানের সাথে ঝুলনখেলার উৎসব—-

আবৃত্তি : রূপছন্দা ঘোষ/ নৃত্যে : সুপ্রদীপ্তা দত্ত

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্ন-শয়ন
করিয়া হেলা রাত্রিবেলা।

ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হা হা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে

হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্।
আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে;
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।
হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন'-পরে।
ব্যথা পাছে লাগে-- দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন
কুসুম-থরে;
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।
দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।

এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার--
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়রোল।
বক্ষ-শোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল!
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত-বোল।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ

চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্।

5. পাঠ : নাহিদ

রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে তাঁর গান, কবিতা, লেখায় 'কথা' গুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কারণ সর্বত্রই সুর বা ছন্দ বা চরিত্র কিংবা গল্পের পটভূমি রথ হতে পারে— কথাই কিন্তু সারথি ।
তাঁর জীবনে দুঃখ বিচ্ছেদ আঘাত মৃত্যুর রূপ ধরে এসেছে বার বার, এ যেন, 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি', তাঁর জীবন দর্শন ও মৃত্যু-দর্শন একই বলয়ে অবস্থিত, তাই সঙ্গে সঙ্গে এক সদর্থক নিশ্চিত ভাবনা —'ঝড়কে পেলেম সাথী' । ব্যক্তিগত বেদনা ও বিচ্ছেদের সন-তারিখ-এর দিকে আলোকপাত করলে হয়তো বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। তাঁর দৃষ্টিতে জীবন-মৃত্যু দুইই সন্ধিক্ষণ, নিয়ে আসে আগমনী বার্তা —কখনো ঊষার, কখনো সায়াহ্নের। কখনো আলোকিত হয় দিন, কখনো আবার জ্বলে ওঠে দীপ বা আকাশ ভরা তারা।

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ, তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥"

মৃত্যু জীবনের অমোঘ পরিণতি, তা নিয়ে এত বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই ।
পুরাতন প্রাণের টানে মন যখন ছুটে চলে মাটির পানে
সেখানে, সেদিনে —কবি ভাবনায় আকুল হয়ে প্রস্ফুটিত অঙ্কুর অর্থাৎ নূতন জীবনের সম্ভাবনা।

গান : আলোক

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে॥
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পূব-বাতাসে--
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ-গানে॥
লাগল যে দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে।

যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে আকুল হল অঙ্কুরেতে

আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়

সেই বাণী মোর সুরে আনে॥

6. **পাঠ : নীতা**

যদিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বোধ এক বিশেষ আকার পায় ১৮৮৪ সালে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুকে ঘিরে, কিন্তু 'মৃত্যু'র সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি পরিচয় কবির বয়স যখন তেরো বছর দশমাস। ১৮৭৫ সাল— প্রয়াতা , মাতা সারদা দেবী। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'মৃত্যুশোক' প্রবন্ধে লিখছেন, মায়ের মৃত্যুর সময় বয়স অল্প এবং ঘটনাটির সময় রাতে, তখন তিনি ঘুমচ্ছিলেন। পরদিন সকালে যখন মৃত্যুসংবাদ শোনেন তখন 'সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেননি।' দেখেছিলেন, মায়ের সুসজ্জিত দেহ খাটের ওপর শোয়ানো। 'জীবন থেকে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করে চোখে পড়েনি। লিখেছেন,

7. **পাঠ :তারেক**

“যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটি প্রধান অঙ্গ, শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না।'

8. **পাঠ : নীতা**

কিন্তু কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে যে চেতনার মুখোমুখি দাঁড় করলো, সেই পরিচয় স্থায়ী। লিখলেন—

9. **পাঠ :তারেক**

'অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া! শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। যাহা নাই, তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই’।

গান : নমিতা রায়চৌধুরী

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।

মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,

রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,

তাপবিমোচন করুণ কোর তব

মৃত্যু-অমৃত করে দান॥

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান

10. পাঠ : সুমিতা

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নতুন বোঠান মারা গেলেন, কী বেদনা বাজলো বুকে। মনে আছে সেই সময়ে আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারী করেছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছি, কোথায় তুমি নতুন বৌঠান, একবার এসে আমায় দেখা দাও। ...সেই সময় আমি এই গানটাই গাইতুম বেশি, আমার বড় প্রিয় গান, বলে গেয়ে উঠেছেন—

গান : নমিতা রায়চৌধুরী

আমার প্রাণের ' পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে--
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।
সে চলে গেল, বলে গেল না-- সে কোথায় গেল ফিরে এল না
আমার প্রাণের ' পরে চলে গেল কে

11. পাঠ : শ্যামলী

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে, মৃত্যু তাঁকে বারবার স্পর্শ করে গেছে, প্রিয়জনদের নানারকম দুঃখ-সওয়া এবং দুঃখ-দেওয়া অকালমৃত্যুগুলি প্রত্যেকটিই একটিমাত্র প্রশ্ন নিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের মনে—-মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক ভাবনাই ভেবেছিলেন তিনি। বারবার তিনি উপলব্ধি করেছেন— মৃত্যু জীবনকে মুক্ত ও সত্যরূপে দেখার একটি জানালামাত্র।

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥

তাই যা চোখের দেখায় শেষ, তা কিন্তু শেষ নয় মোটেই , অন্ধকার দুয়ারের ওপর পারেই আছে সেই জ্যোতির্ময় আলো—

গান : কমলপ্রিয়া রায়

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে ॥.....

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?

আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে ॥

12. পাঠ : সুমিতা বসু

স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মারা গেলেন ৩০ বছর বয়সে ১৯০২ সালে —কবির বয়স ৪১। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর মাত্র দশ মাস পর ১৯০৩ সালে নববিবাহিতা বারো বছরের দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার মৃত্যুতে বুক ভাঙলেও -- প্রকাশ ছিল তার সংযত। রোগশয্যায় রেণুকা বলতেন, বাবা 'পিতা নহসি' বলো। স্নেহকাতর পিতা মুমূর্ষু কন্যার আবদার রাখতে রাখতে নিজেকে সামলে নিতেন কোনোমতে। এরপর মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত ছিনিয়ে নিল তাঁর কনিষ্ঠতম সন্তান শমীন্দ্রনাথকে। শমীর মৃত্যু এতো দুঃখ নিয়ে এলো যে, কবি বুঝি বলে উঠলেন- আরো দুঃখ! রাখবো কোথায়? ১৮ অক্টোবর, ১৯১৩ লিখেছিলেন,

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

বরাবরের মতো এবারও শান্তি খুঁজলেন প্রকৃতিতে, খুঁজলেন নিজের মধ্যে, নিজের হৃদয় / হিয়ার মাঝে, ফিরে আসছে সেই উপনিষদের তত্ত্ব বা বৌল জীবনবোধ : আত্মন ব্রহ্মম তাই যখনি আমরা হৃদয়-পানে না চেয়ে বাহির-পানে চোখ মেলি-- তখনি বিরহ, বিচ্ছেদ ও মৃত্যুভয়।

গান : বিশ্বরূচি

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি॥
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি॥
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি

তোমায় দেখতে আমি পাই নি...

13. পাঠ : নীতা

ব্যক্তিগত বিপুল শোকের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়েও তিনি বলতে পারেন, "প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে/ প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে/ তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া॥ শঙ্খ ঘোষ, "এ আমির আবরণ"-এ লিখেছেন, "শমীর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই কার শক্তিতে কবি লিখতে পেরেছিলেন "তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া"? তিনি ধর্মীয় কোনো ঈশ্বর না-ও হতে পারেন কারো কাছে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের কোনো দেবতা, আত্মশক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্যে কোনো দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা, সেটা মনে রাখা চাই। সেই দেবতাকে পাবার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো কথা ওঠে না আর, কথা ওঠে শুধু অন্তর্মুখিতার, আত্মদীক্ষার, সমস্যা সেখানে কেবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।

আবৃত্তি :শ্যামলী

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

গান : অচিন্ত্য

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ--
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে....

14. পাঠ :তারেক

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, 'আমাদের ঋষিরা বলেছেন, পরকে যে আত্মবৎ দেখেছে সেই সত্যকে দেখেছে।' বাউলের গান শুনেছি কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর থর্অ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়-- যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা-- অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর-- তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন "মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল--

"কোথায় পাব তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে/ দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে"—

বাউলের গান— ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।'

এখন একটি বাউল গানের পাশাপাশি একটি রবীন্দ্রসংগীতও শুনব, দুটিতে ভাবের কি অপূর্ব মিল।

গান: নাহিদ

আমি অপার হয়ে বসে আছি
ওহে দয়াময়
পারে লোয়ে যাও আমায়
আমি একা রইলাম ঘটে
ভানু সে বসিল পাটে।
আমি তোমাবিনে ঘোর সঙ্কটে
দেখিনা উপায়।।
পারে লোয়ে যাও আমায়....

15. পাঠ : সুমিতা বসু

লালনের এই গানটির সঙ্গে অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীতের ভাবগত সাদৃশ্য পাই , যেমন :
সন্ধ্যা হল গো-- ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো

ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি,
আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম
চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান
দিন তো চলি গেল, প্রভু, বৃথা-- কাতরে কাঁদে হিয়া।
এবার শুনবো একটি রবীন্দ্রসংগীত: তোমার পথ চেয়ে বেলা যাওয়ার গান, আসবে কখন সেই খেয়ার নেয়ে, যখন... শূন্য ঘাটে একা আমি....

গান: নমিতা

শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে॥
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে॥
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।

16. পাঠ : নীতা

রবীন্দ্রনাথ-এর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সর্বজনগ্রাহ্য ও বিদিত। বাংলায় ক্লাসিক বা ধ্রুপদী সাহিত্য বলতে যা বোঝায়। অথচ কল্লোলের কবিরা একসময় তীব্র বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'কল্লোলের পথ সহজ পথ নয়, স্বকীয়তার পথ' আবার তাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে 'একমাত্র সূর্য' বলে পরবর্তী কালে বন্দনাও করেছেন।

কল্লোলের যুগে আধুনিক কবিরা, যাঁরা কালের দিক দিয়ে মহাযুদ্ধ-পরতর্বী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত, তাঁরাও সেই ৭ ই অগাস্ট ১৯৪১— তাঁরই কবিতার মতো অনাথ পিতৃহীন হয়ে পড়লেন। সারা বাংলা, সারা ভারতবর্ষ সারা বিশ্ব জুড়ে যে শাখায় ফুল ফোটেনি, ফল ধরেনি অথবা যা আপাতভাবে মনে হতো সম্পূর্ণ পূর্ণ —তাও কেমন যেন অর্থহীন হয়ে গেল..... যেমন, যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একসময় বলেছিলেন, ' সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর / আপন চোখের থেকে জ্বলিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো / যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে।
সেই অচিন্ত্য কুমারই পববর্তী কালে রবি অস্তমিত হলে— লিখছেন, "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় :

আবৃত্তি :নাহিদ সুলতানা

আমি তো ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে

গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে !
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে |
চমকি উঠিনু জাগি'
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে——
ঝড়ের ঝাপট লগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিলো মোর্রেব সনাশা গতির তটিনী |
তুমি ছাড়া কে পরিতো
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কার
এ-উদাত্ত হাহাকার——
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে |

17. পাঠ : শ্যামলী

রবীন্দ্রপ্রভাব আজ তাঁর মৃত্যুর ৭৯ বছর পরেও আমাদের প্রাণে-মনে-জীবনে প্রত্যক্ষ।
ধরা যাক, আমরা যাঁদের পঞ্চাশের কবি বলে জানি এবং তাঁর মৃত্যুদিনে যাঁরা ছিলেন বালক বয়সী, তাঁদের কথা। পরবর্তী কালে তাঁদেরই সেই ২২শে শ্রাবণের সময়ের কথা আর লেখায় তিনি চিরভাস্বর হয়ে রইলেন: এরকমই এক গল্প— গরমের ছুটিতে জানালার ধারে বসে বই পড়ছিল ক্লাস ফাইভের ছাত্রটি। হঠাৎ এক বন্ধু ছুটে এসে খবর দিল — অ্যাই জানিস, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন! বালকটি কী ভাবল কে জানে... হাতের বইটির প্রচ্ছদে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তার সামনে ৺ লিখে দিল।
সেই বালক শঙ্খ ঘোষ-- বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ !

18. পাঠ : **কমলপ্রিয়া**

সেদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন বালক বয়সে, পরতর্বী কালে সুনীল লিখলেন, "কোনো নবীন লেখক যদি সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নিজস্ব ভাষা সন্ধানের চেষ্টা না করে, রবীন্দ্রনাথেই আপ্লুত হয়ে থাকে, সে অতি মূর্খ। পরিণত বয়সেও যদি কোনো লেখক রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে থাকে, তাঁকে জীবনযাপনের সঙ্গী করে না নেয়, তা হলে সে আরও বড় মূর্খ "!
শক্তি চট্টোপাধ্যায় "বৃষ্টি পড়ে টাপুর, টুপুর" কবিতাটিতে লিখলেন:

18 a **আবৃত্তি : সুমিতা**

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
হৃদয় ভরে বান
আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে
রবিঠাকুরের গান
রবিঠাকুরের গান ওরে ভাই
রবিঠাকুরের ছবি
ঘরে এবং ঘরের বাইরে
যখন একলা হবি
কাজিফুল কুড়োতে কুড়োতে
জড়িয়ে গেলি মালায়
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম
এক ঠাকুরের জ্বালায়।

18 b **পাঠ : কমলপ্রিয়া**

কবি একদিন লিখেছিলেন, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/ তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।'
ক্যালেন্ডারের সন তারিখ অনেক অনেক পেরিয়ে আমরা প্রতিদিন বলতে চাই, আমাদের সকল খেলায় আমরা যে নিত্যদিন তোমায় দেখি কবিগুরু...ওই যেখানে 'নবীন জীবন দেয় গো পুরে গানের সুরে', সেই আকাশের আনন্দবাণী হৃদয়মাঝে নিয়ে আমরাও যেন —

গান:কমলপ্রিয়া

"তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি / গানের সুরে॥"

19. **পাঠ : নীতা**

'বাইশে শ্রাবণ' সেই মহাপ্রয়াণের আজ ৭৯ বছর পরেও এটি আমাদের কাছে এক বিপন্নতার দিন নয়

বরং পবিত্র সরকারের লেখনীতে এই দিনটি, "জেগে আছে বর্ণময় তীব্র বহুস্বর, আমরা তাই নিয়ে বাঁচি, ছিন্নভিন্ন এ অস্তিত্বে অমরত্ব পাই নিরন্তর।" রবীন্দ্রভাবনা ও জীবনদর্শনে মৃত্যু দুয়ারটুকু পেরিয়ে গিয়ে অমৃতধামের পথে, অরূপতনের সন্ধানে এক আনন্দময় যাত্রা। মানবজন্ম তো শুধু দৈনিক ও দৈহিক সীমাবদ্ধতায় 'খাঁচার পাখি' নয়, ওই যে বিপুল-সুদূর —ব্যাকুল হয়ে তার বাঁশিটি বাজাচ্ছে—_

আমি চঞ্চল হে—এই ভাবনা থেকেই আমরা পরিবেশন করছি ডাকঘর নাটকটি কলাকুশলী সকলেই প্রবাসবন্ধুর সভ্য-সভ্যা। শুরু হচ্ছে :

ডাকঘর

মাধব দত্ত : পিসেমশায় : অচিন্ত্য
ঠাকুরদা /ফকির : তারেক
দই ওয়ালা : বিশ্বরূচি
প্রহরী : শফিক
কবিরাজ: কাজল
রাজ্ কবিরাজ : বিশ্বরূচি
মোড়ল: শফিক
সুধা : শ্যামলী
অমল : সোমা

****

মাধব দত্ত। মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না -- কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে --

কবিরাজ। ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে; কিন্তু আয়ুর্বেদে যেরকম লিখছে তাতে তো --

মাধব দত্ত। বলেন কী!

কবিরাজ। (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দত্ত। সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে.....।

কবিরাজ। আমি তো পর্বেূই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত। ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ। তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ.... আমি যাই

ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা। কেন? কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত। তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা। তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই -- তোমার খেপবার বয়সও গেছে -- তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত। ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা। বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা। আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দত্ত। কবিরাজ বলছে তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যে-রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা -- তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা। হা হা, আচ্ছা আমি একটু ঘুরে আসি....

অমল। পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। কী অমল?

অমল। আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে -- ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল। আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত। সত্যি নাকি? কী রকম শুনি।

অমল। তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয়?

মাধব দত্ত। হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল। বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব। খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজুতো পরা লোকটা লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে -- তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত। আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি --

অমল। তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

দইওআলার প্রবেশ

দইওআলা। দই -- দই -- ভালো দই!

অমল। দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা!

দইওআলা। ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল। কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল। আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে--ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড় -- শামলী নদী -- কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি -- কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম -- একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে।

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। যাব বই কি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল। আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে -- ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই! মরে যাই...দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই -- ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর! আহা গো !
তুমি বসো বাবা , আমি যাই ...দ...ই দ...ই ভালো দ.....ই.....

প্রহরীর প্রবেশ

অমল। প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাওনা প্রহরী!

প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল। কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল। কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী। একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল। রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে! কিন্তু আমাকে যে করিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী। না, এখনো সময় হয় নি।

অমল। কেউ বলে "সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে সময় হয় নি। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী। সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা- আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে -- দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায় -- তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে -- ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

প্রহরী। ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল। কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

প্রহরী। সে কথা কেউ জানে না।

অমল। সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই -- যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল। আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী। হবে বই কি!

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে। আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে -- ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী। ও...ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর। -- এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী। আসে বৈকি। দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে। আমি চলি —

ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল। কে ? ও ফকির ! ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন -- এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

অমল। পথে? কোন্ পথে! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফকির! আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই -- মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি -- সে অনেকদিন আগে -- কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে -- বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। সে কেবলই রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে -- নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে -- আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি।

সোমনাথ

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ও বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে॥
ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

অমল। ফকির, যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব।

ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে 'জয় হোক' বলে ভিক্ষা চাইব -- আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব -- সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। আচ্ছা ফকির, তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিষের কোনো ভার নেই — সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে -- একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছোবে...কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা না-ই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে -- তা হলেই হল।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত। তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফেসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি?

ঠাকুরদা। কেন? হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে?

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল! রাগ করবে! কেমন রাগ করে দেখি-না।

অমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না?

ঠাকুরদা। আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ। আজ কেমন ঠেকছে?

অমল। কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে -- মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ। উঁহু উঁহু....ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ওই যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম

কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

অমল। ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল। ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ।

মাধব দত্ত। বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। চমকিয়া উঠিয়া/ সত্যি!

মোড়ল। এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু,আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে -- আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

অমল। ফকির, ওই যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না? মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ -- তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি--দাও আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল। না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো।

ঠাকুরদা। ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।

বাহিরে দ্বারে আঘাত

মাধব দত্ত। ওকি ও! ও কে ও! এ কী উৎপাত?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। কে তোমরা?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

রাজদূত। মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।

মোড়ল। কী বর্সনাশ!

অমল। কত রাত্রে দূত? কত রাত্রে?

দূত। আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল। যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, -- তখন?

দূত। হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

রাজকবিরাজের প্রবেশ

রাজকবিরাজ। একি! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও। -- (অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ।

অমল। খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজমশাই। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছ -- সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি --অন্ধকারের ওপারকার সব তারা। আঃ অন্ধকারে.....

কমলপ্রিয়া রায় : গান :

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে, গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥

রাজ কবিরাজ। অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে?

অমল। পারব, আমি পারব। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও....

মাধব দত্ত। (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন -- তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব।

অমল। সে আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পিসেমশায় -- সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধব দত্ত। কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল। আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন -- আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত। (ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল।

রাজ কবিরাজ। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব -- ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও -- এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে।

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

সুধার প্রবেশ

সুধা। অমল।

রাজকবিরাজ। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা। আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি -- ওর হাতে কি দিতে পারব না।

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা। ও কখন জাগবে?

রাজ কবিরাজ। এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ। কী বলব?

সুধা। বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি।

কমলপ্রিয়া রায়: গান / উর্মি ঘোষ : নাচ

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।.....
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি--
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি॥
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর আমি উদাসী।

আমি চঞ্চল হে,

আমি সুদূরের পিয়াসি।.....

==========

Namita

নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো--
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ধ্রুব-পানে॥

Chorus and NAMITA all along

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। Kamalpriya and Aloke **1**
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে॥ Amit **2**
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, Nahid and Tareque **3**
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো— Safique and Soma **4**
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥ Achintya & Rupchhanda **5**
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে Asit da & **CHORUS** **6**
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব Kajal **7**
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। Neeta **8**
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, Shyamali **9**
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—Somnath **10**
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে॥Biswaruchi **11**
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে Sumita **& CHORUS** **12**

Namita